উত্তররৈবিক কবিতা বর্ষা : বুদ্ধদেব বসু

রথীন কর

কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ আষাঢ়ের মৃদঙ্গের তালে 'জগতের যত অকর্মণ্য ভাবের ভাবুক, রসের রসিক' খেপার দলকে নাচের আসরে ডেকেছিলেন। তাঁর কবিতা গান ও বিভিন্ন সৃষ্টিতে বর্ষারাণী তার মোহজাল বিস্তার করেছে। কিন্তু উত্তররৈবিক আধুনিক কবিদের বর্ষার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে 'কবিতাভবন' থেকে প্রকাশিত আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলন গ্রন্থের অনবদ্য ভূমিকায় আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা ঠিক কোন্‌খান থেকে আরম্ভ হয়েছে বলা শক্ত, প্রাচীন ও আধুনিকের মাঝখানে সব জায়গায় প্রাকৃতিক সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না। কালের দিকে থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কব্যেকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।' রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার প্রণেতা পুরুষ বলে স্বীকৃত বুদ্ধদেব বসু তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ 'শার্ল বোদ্‌লেয়ার' -এ তাঁর কবিতার ভূমিকায় ঘোষণা করলেন, 'যা-কিছু কবিতা নয়, তা থেকে কবিতার মুক্তির প্রথম দলিল 'ফ্ল্যুর দা মাল' (যার বাংলা করা হয়েছে ক্লেদজ কুসুম) এবং সেজন্য, তাঁর মতে, আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণ ১৯৫৭। বোদ্‌লেয়ারের কবিতায় প্রথম চিত্রায়িত হল নাগরিক জীবনের ক্লেদ, গ্লানি, বিষাদ ও প্রসাধনিক কৃত্রিমতা। দর্পণের সম্মুখে কবির নিরন্তর আত্মদর্শন ও আত্মপরীক্ষা। এভাবেই তাঁর চেতনার উন্মেষ।' বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, মার্ক্সীয় তত্ত্ব, বিবর্তনবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান এযাবৎ পুষ্ট ধ্যানধারণার সরলরৈখিক ভিত্তিভূমিটাই টালমাটাল করে দিল। 'হৃদয়পুরে চলিতেছিল খেলা।' মানুষ মানুষীর সম্পর্ক যে যৌন গন্ধী সেই তত্ত্ব প্রচারের ফলে নীতি দুর্নীতির বিভেদরেখাটি ক্ষীণ হয়ে গেল। এক ধরনের কৃত্রিমতা, নেতিবাদ, ঘৃণা, তিক্ততা, হতাশা, বিতৃষ্ণা আধুনিকতার বিজয় পতাকা বহন করে চললো। কুৎসিতের পূজাবেদীমূলে সৌন্দর্যের বলিদান। টি. এস. এলিয়ট ও অনুবর্তী কবিদের সৃষ্টিতে এই বিষণ্ণ সময়েরই প্রতিফলন।

এই পশ্চিমী আধুনিকতার তরঙ্গোচ্ছ্বাস বাংলা কবিতার অঙ্গনে আছড়ে পড়লো, রবীন্দ্রনাথের ছিল নিজস্ব নিষ্কম্প মঙ্গলচেতনা। যুদ্ধোত্তর অস্থিরতা, ছিন্ন-মূল বিষাদ, অবিশ্বাস, নৈরাজ্য, সমাজ-পরিবার প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ আধুনিকতার সময় পতাকা স্কন্ধে তুলে নিয়ে সমমনস্ক যেসব কবিদের আবির্ভাব, তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৩), জীবনানন্দ দাশ (১৯৯৯-১৯৫৪), অজিতকুমার দত্ত, (১৯০৭-১৯৭৯), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৬৮), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), এবং বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)।

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন অখণ্ড আবিশ্ববিস্তারী কাব্যজগতের অধিবাসী। তিনি ছিলেন জীবনবাদী কবি, সূক্ষ্ম কবিমননের অধিকারী এবং জীবনের কুশ্রীতা থেকে যে শিল্প ও সৌন্দর্য ছেনে নেওয়া যায় এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। রবীন্দ্র ঐতিহ্য তথ্য রোমান্টিক ঐতিহ্য বিদীর্ণ করেই কবিতাচর্চা শুরু করেছিলেন তিনি। তীব্র আত্মগত ভাবকে নিরাসক্তি বা নৈর্ব্যক্তিকতার দ্বারা শোধিত করে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কবিতার মায়াঞ্জন। আত্মানুসন্ধানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। শতবর্ষে আধুনিকতার পথিকৃৎ এই কবিকে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আমাদের মূল বিষয় ছিল বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় বর্ষা। উত্তররৈবিক আধুনিক কবিতার গতিপ্রকৃতি এবং বুদ্ধদেবের কবিতার উপরোক্ত মূল বৈশিষ্ট্যগুলির প্রেক্ষিতে তাঁর বর্ষার কবিতার কিছু ঝলক উপলব্ধি করতে পারি। নাগরিক বর্ষা নগরজীবনের মতোই ক্লান্তিকর। নগরজীবনের বিপর্যস্ত তীব্র আত্মসচেতন কবির কাছে বিরক্তিকর, ধূসর বারিধারা তেমন সুখপ্রদ অভিজ্ঞতা নয়—

বৃষ্টি আর ঝড়, বৃষ্টি আর ঝড়, রাত্রি আর দিন।
দিন ধূসর, বন্ধ্যা, অন্ধকার, আলো নেই,
ছায়াও নেই, শুধু বৃষ্টির কুয়াশা, শুধু মেঘের আবছায়া, আর
ট্রামের গোঙানি, ট্রাফিকের ঘর্ঘর

কিন্তু গ্রামবাংলার বর্ষার নয়নলোভন রূপ আর গোয়ালন্দের ইলিশ কবিকে আপ্লুত করে —খসে পড়ে আধুনিকতার প্রসাধন।

আকাশে আষাঢ় এলো, বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল,
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে তীরে নারিকেল সারি
বৃষ্টিতে ধূমল।
রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য রাশি রাশি ইলিশের শব।
....

এলো বর্ষা, ইলিশ উৎসব

(ইলিশ)

এই বর্ষা তো হৃদয় হারাবার সময়। রবীন্দ্রনাথ তো বলেই গেছেন 'এমন দিনে তারে বলা যায় এমন ঘনঘোর বরিষায়।' আধুনিক মননের নাগরিক জীবনের কবি হলেও বুদ্ধদেব বসু সব হারানোর বাজি ধরতে চান বর্ষাঋতুতে।

পথের পাথরে উড়ছে জলের ধোঁয়া,
উঁচু গাছগুলি মাথা নিচু করে চুপ,
বস্তুগুলিতে তরলিত এই দিনে
সেই ভালো হয়, সব যদি যায় খোওয়া

(বর্ষার দিন)

কবির চোখে প্রকৃতি ধরা দেয় — দর্দুরের উচ্চকিত ঐকতানে—

ঘাস হলো ঘনমেঘ; স্বচ্ছ জল জমে আছে মাঠে,
উদ্ধত আনন্দগানে উৎসবের দ্বিপ্রহর কাটে।
স্পর্শময় বর্ষা এলো; কী মসৃণ তরুণ কর্দম।
স্ফীতকণ্ঠ, বীতস্কন্ধ — সংগীতের শরীরী সপ্তম।

(ব্যাং)

নদীর বুকে যখন বৃষ্টি পড়ে, জোয়ার আসে জলে, তখন আকারহীন হিংস্র ফেনিল জলে হৃদয়লীন ব্যথা গুমরে ওঠে—

আকাশ-ভরা মেঘের ভারে
বিদ্যুতের ব্যথা
গুমরে ওঠে জানায় শুধু
অবোধ আকুলতা।

'সময় হারানো স্বপ্ন - জড়ানো দিনে' বৃষ্টিভেজা রোমান্সের আমেজ থাকলেও নাগরিক কবি বুদ্ধদেব নগরজীবনের ক্লান্তি ও হতাশা ভুলতে পারেন না। 'বর্ষার দিন' কবিতায় সেজন্য কবির আক্ষেপ—

ব্যর্থজীবন মূর্ত করেছে যেন
দু-দিনের দাড়ি, রজকরহিত সজ্জা,
শ্রাবণ-তাড়ানো উগ্র-বিজলি জ্বলা
শতনিঃশ্বাসে আবিকল রুদ্ধ ঘরে
আজ বাঁধা পড়ে আগামী কালের ঋণ।

'দুই বর্ষা' কবিতাটিতেও শান্তিনিকেতন এবং গ্রাম্য বাংলায় অসমে বর্ষার তুলনায় নাগরিক বর্ষার খিন্নরূপটি প্রতিভাত হয়েছে—

সেই বর্ষা দেখি আজো। কলকাতার দোতলার ফ্ল্যাটে
রুদ্ধ দেহমন, শূন্যে চেয়ে শূন্যমনে বেলা কাটে।
বিষণ্ণ মলিন দিন। অপরাহ্ন সংকীর্ণ কৃপণ,
চায়ে চিনি নেই।

এখানে 'নিরানন্দ নিষ্প্রদীপ রাজধানী প্রাণের গুমোটে মৌন।'

'বৃষ্টি' কবিতায় এই কবিই আবার বর্ষার স্তনদায়িনী শস্যদাত্রী রূপকে সাদরে আহ্বান করেছেন—

এসো তুমি অর্ধ-সৃষ্টি অস্পষ্ট অতলে
মাটি যেথা জল হয়ে ঝরে, জল যেথা অগ্নি হয়ে জ্বলে
অগ্নি যেথা বায়ু হয়ে শূন্যে মিশে যায়
এসো মগ্ন বঞ্চনার মূলে, এসো তুমি সত্তার শিকড়ে,
মুক্ত করো সৃষ্টি উদ্দাম বীজ,
ছিন্ন স্তব্ধতার পাষাণ-শৃঙ্খল।

শ্রাবণ যখন কবির বুকে 'সোনার শ্যামলে গাঁথা' তার মালাগাছি পরিয়ে দেয়, তখন কবির সোল্লাস উচ্চারণ, 'কতভাগ্য যে বেঁচে আছি, বেঁচে আছি।'